



নানা রঙের দিন

অ জি তে শ ব ন্দ্যো পা ধ্য য়

চরিত্রলিপি

রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় বৃন্দ অভিনেতা (৬৮)

কালীনাথ সেন প্রম্পটার (প্রায় ৬০)

[পেশাদারি থিয়েটারের একটি ফাঁকা মঞ্চ। পিছনে রয়েছে রাত্রে অভিনীত নাটকের অবশিষ্ট দৃশ্যপট; জিনিসপত্র আর যন্ত্রপাতি। মঞ্চের মাঝখানে একটি টুল ওলটানো রয়েছে।...এখন রাত্রি। চারিদিকে অন্ধকার। দিলদারের পোশাক পরে প্রবেশ করেন রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর হাতে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি। হাসছেন তিনি।]

রজনী : আচ্ছা, ব্যাপারটা কী বলো তো? কী গেরো! ঘুমোলুম তো ঘুমোলুম একেবারে গ্রিনরুমে? নাটক কখন শেষ হয়ে গেছে, হল ফাঁকা, শাহাজান-জাহানারা সব পাত্রপাত্রী ভোঁভোঁ—আর আমি দিলদার—এতক্ষণ পড়ে পড়ে গ্রিনরুমে নাক ডাকছিলুম। ধুর, বারোটা বেজে গেছে আমার—বারোটা বেজে পাঁচ। রাত কত হল কে জানে। এত টানলে কি আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে? চেয়ারে পড়েছি আর ঘুম! বাঃ বাঃ বুঢ়া। আচ্ছাহি কিয়া। ক্যায়া হোগা তুম্‌সে? কুছ নেহি। বিলকুল কুছ নেহি। [চৈঁচিয়ে]

রামব্রিজ! এ রামব্রিজ!—আরে, গেল কোথায় লোকটা? কোথায় ধেনো টেনে পড়ে আছে ব্যাটা।
এ রামব্রিজ—

[হতাশ হয়ে পড়েন। টুলটা সোজা করে তার উপর বসেন। মোমবাতিটাকে মাটিতে রাখেন।]

—চারিদিক নিঃবুম।—খালি আমার গলাটাই ঘুরেফিরে কানে বাজছে আমার। কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে।—কাল রাতেও ঠিক একই ব্যাপার। মদ গিলে গ্রিনরুমে পড়েছিলুম। রামব্রিজই ঘুম থেকে তুলে ট্যাক্সি ডেকে দিয়েছিল। তার দরুন আজ সন্ধ্যাবেলা নগদ তিনটে টাকা বকশিশও দিলুম ওকে। আর তার ফল হল কী? না, সেই টাকায় তিনি নিজেই আজকে মদ গিলে কোথায় পড়ে আছেন। নিঃশ্বাস মেইন গেটে তালা পড়ে গেছে।—আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে যা হোক। [মাথা ঝাঁকিয়ে]

উফ, আজ রাতে কতটা গিলেছি? মাতালের এই হচ্ছে বিপদ। ছাড়ব বললে ছাড়ান নেই। আরে বাবা,—দিলুম, তোকে বকশিশ দিলুম, না উনি আবার সেই আনন্দে আমাকেই দেড় বোতল খাইয়ে গেলেন। এঃ, একেবারে রামধেনো। উফ বুকের ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে যে। মুখের ভেতরটা যেন অডিটোরিয়াম—ইন্টারভ্যালের সব দর্শকরা হাঁটাহাঁটি লাগিয়ে দিয়েছে—উঃ জিভটা টানছে কীরে বাবা।—[একটু থামেন]

অকারণ—অকারণে বাবা। কেউ যদি বলে, “রজনীবাবু অনেক তো বয়েস হল, এবার মদ খাওয়াটা ছাড়ুন।” কোনো জবাব আছে? উঁহু, রোজ দিন যায়, সন্ধ্য হয়, আর মদ খাই! উঃ ভগবান! শিরদাঁড়াটা গেল—বুকটা কী ভীষণ কাঁপছে—মনে হচ্ছে যেন—“রজনীবাবু ভাই, শরীরটার দিকে একটু নজর দিন—আর কী এ বয়েসে এত সয়? কত বুড়ো হয়েছেন ভাবুন দিকিনি—”[থামেন] হ্যাঁ, বুড়ো হয়েছেন বই—কি রজনীবাবু—আটষট্টিটা বছর কি নেহাৎ কম বয়েস, অ্যাঁ? ছোকরাদের মতো ঢং ঢাং করতে পারেন, লম্বাচওড়া চেহারাটা আছে, আরও চালিয়ে দেবেন কিছুদিন। লম্বা লম্বা চুলে ডেইলি হাফ শিশি কলপ লাগিয়ে যেরকম ইয়ার্কি টিয়ার্কি মারেন, তাতে বয়েসটা ঠিক বোঝা যায় না—কিন্তু যা গেল, সে কি আর ফিরবে? আটষট্টিটা বছর—এক-পা এক-পা করে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে—আর জীবনে ভোর নেই, সকাল নেই, দুপুর নেই,—সন্ধ্যও ফুরিয়েছে—এখন শুধু মাঝরাাত্রির অপেক্ষা—এখানেই গল্প শেষ। এরপর রজনীবাবু এসে বলবেন, “আমি লাস্ট সিনে প্লে করব না ভাই, আমাকে ছেড়ে দিন।”—কিন্তু কার্টেন উঠবেই—শ্মশানঘাট—পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, ওপারের দূত উইংসে রেডি—[একটু থামেন। সামনের দিকে তাকান—হলের শেষ প্রান্তে।]

জানেন রজনীবাবু, এই পঁয়তাল্লিশ বছর থিয়েটারের জীবনে এই প্রথম মাঝরাাত্রিতে একা—একেবারে একা—স্টেজে দাঁড়িয়ে আছি—জীবনে প্রথম। কেন জানেন?—এ হচ্ছে সবই মাতালের কারবার। [ফুটলাইটের কাছে যান]

—সামনেটা কিছু দেখা যায় না। ওই দূরে তো ব্যালকনি, না?

—ফার্স্ট বক্সটাও দেখতে পাচ্ছি এখন—ওই তো সেকেন্ড—থার্ড—ফোর্থ বক্সটাও—সব গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে—সব মিলিয়ে যেন একটা শ্মশান, যেন ওর দেয়ালে কালো কালো অঙ্কারে

লেখা আছে জীবনের শেষ কথাগুলো—কত নড়াচড়া, কত উদ্বেগ, কত প্রেম, কত মায়া। সব মিলিয়ে যেন মৃত্যুর নিঃবুম ঘুমের আয়োজন করে রেখেছে কারা, উঃ কী শীত—সব আছে শুধু মানুষ নেই—সব ভূতুড়ে বাড়ির মতো খাঁ খাঁ করছে—মরে গেছে নাকি? শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে কীরকম শিরশির করছে যেন—[হঠাৎ টেঁচিয়ে] রামব্রিজ! রামব্রিজ! কাঁহা গ্যায়া রে—উঃ এই মাঝরাতে একা একা কীসব মৃত্যু, শ্মশান আবোলতাবোল ভাবছি। হবে না কেন? কম গিলেছি আজকে। “মদটা ছেড়ে দিন রজনীবাবু, মদটা ছেড়ে দিন। বুড়ো হয়ে গেছেন, আর দু-দিন বাদেই খাটে উঠবেন মশাই। ধরুন, আপনার মতো বয়েস হয়েছে যাঁদের—আটষট্টিটা বছর, তাঁরা সময়মতো মাপজোখ করে খাওয়াদাওয়া করেন—সকাল-সন্ধ্য বেড়াতে যান, সন্ধ্যবেলা কেণ্ডনটেণ্ডন শোনের, ভগবানের নাম করেন—আর আপনি রজনীবাবু এসব কী করছেন মশাই? মাঝরাতে দিলদারের পোষাক পরে, পেটভর্তি মদ গিলে, এসব থিয়েটারি ভাষায় কী আবোলতাবোল বলছেন বলুন তো? কেউ শুনলে ভয় পেয়ে যাবে যে, আন্দাজ করুন দিকি, আপনার চোখগুলো দেখতে এখন কেমন লাগছে। যান যান মেকআপ টেকআপ তুলে, চুলটুল আঁচড়ে, ভদ্র গোছের জামাকাপড় পরে বাড়ি যান দিকিনি। কী যে পাগলামি করেন। সারারাত ধরে এইসব ভাবলে হঠাৎ হার্টফেল করবেন যে।”—

[উইংস দিয়ে বেরিয়ে যেতে চান। যেই এগিয়েছেন অমনি দেখা গেল—পরনে ময়লা পাজামা, গায়ে কালো চাদর, এলোমেলো চুল, বুড়ো কালীনাথ সেন ঢোকেন। রজনীবাবু ভয়ে চিৎকার করে পিছিয়ে যান।] কে কী চাই তোমার? কী চাই?

[অর্ধেক রাগ, অর্ধেক মিনতি করে] কে? কে তুমি?

কালীনাথ : আমি।

রজনী : [এখনও ভয় পেয়ে] কে, নাম বলো?

কালীনাথ : [আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে] আমি চাটুজ্জেমশাই—আমি কালীনাথ—আপনাদের প্রম্পটার কালীনাথ—

[রজনীকান্ত অসহায় হয়ে টুলের উপর বসে পড়েন। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়তে থাকে, সারা শরীর কাঁপতে থাকে।]

রজনী : অ্যাঁ, কে? ও তুমি, তুমি কালীনাথ? তুমি এত রাতে কী করছিলে এখানে?

কালীনাথ : আমি রোজ লুকিয়ে গ্লিনরুমে ঘুমেই চাটুজ্জেমশাই—কেউ জানে না—আপনি বামুন-মানুষ, মিছে কথা বলব না—আপনার পায়ে ধরছি, এ কথাটা মালিকের কানে তুলবেন না চাটুজ্জেমশাই, আমার শোয়ার জায়গা নেই, একেবারে বেঘোরে মারা পড়ব তাহলে—

রজনী : ওহ, তুমি কালীনাথ! তাই বলো? বলো কালীনাথ, তুমি, কী হয়েছে জানো—আজকের শো-তে আমি সাতটা ক্ল্যাপ পেয়েছি—দু-বার তো স্পষ্ট শুনছি, “মাইরি, এই না হলে অ্যাকটিং!” কে যেন একবার বললে, “দেখছ, রজনী চাটুজ্জেম ইজ্ রজনী চাটুজ্জেম—মরা হাতি সোয়া লাখ।” তাহলেই বুঝলে কালীনাথ, পাবলিক এখনও কীরকম ভালোবাসে আমাকে?—আসলে যতক্ষণ স্টেজে দাঁড়িয়ে থাকি ততক্ষণ কদর। তারপর যে যার ঘরে যায়, তখন কে কার! কে-ই বা এই

বুড়ো মাতালটার খোঁজ করে, বলে, “উঠুন রজনীবাবু, চলুন, বাড়ি যাবেন?” কেউ বলে না।—

কালীনাথ : বাড়ি চলুন, আপনাকে আমি বাড়ি পৌঁছে দেব—

রজনী : কেন,—বাড়ি কেন,—কোথায়—

কালীনাথ : আপনার মনে পড়ছে না আপনার বাড়ি কোথায়?

রজনী : তা পড়েছে বই-কি! কিন্তু কী হবে বাড়ি ফিরে— একটুও ভালো লাগে না বাড়িতে! জানো কালীনাথ পৃথিবীতে আমি একা! আমার আপনজন কেউ নেই—বউ নেই, ছেলেমেয়ে নেই, সঙ্গীসাথি নেই, কেউ কোথাও নেই—আমি একদম একা—একেবারে নিঃসঙ্গ—কেমন জানো? ধু-ধু করা দুপুরে জ্বলন্ত মাঠে বাতাস যেমন একা—যেমন সঙ্গীহীন—তেমনি—আদর করে একটা কথা বলে, এমন কোনো লোক আছে আমার? মরবার সময় মুখে দু-ফোঁটা জল দেয় এমন কেউ নেই আমার। আর—জানো, যখনই এইসব কথা ভাবি, তখনই ভয়ে যেন বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসে আমার, তখন কেউ দুটো ভালো কথা বলে? কেউ কি এই বুড়ো মাতালটার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়? দেয় না। আমি কার? কে চায় আমাকে?

কালীনাথ : [জলভরা চোখে] পাবলিক তো আপনাকে ভালোবাসে চাটুজ্জেশাই।—

রজনী : পাবলিক? এই মাঝরাতে পাবলিক এখন থিয়েটার দেখে-টেখে গিয়ে, টেনে ঘুম লাগাচ্ছে। তুমি কি ভাবছ পাবলিক আমাকে এমনই ভালোবাসে যে ঘুমের ঘোরে আমাকে স্বপ্ন দেখছে?—পাগল! আমাকে আর কেউ চায় না কালীনাথ, কেউ না—আমার ঘরসংসার, বউ-ছেলেমেয়ে, কেউ নেই—কিছু নেই—

কালীনাথ : কিন্তু তাই নিয়ে আপনার মতো লোকের এত দুঃখ চাটুজ্জেশাই—

রজনী : কেন, আমিও তো মানুষ কালীনাথ। হাত-পা-ওয়ালা একটা জ্যান্ত মানুষ। আমারও তো আর পাঁচজনের মতো হাত-পা আছে। আমার শিরায় শিরায় কি জল বইছে? রক্ত বইছে না? সঙ্গের পবিত্র রক্ত।—বিশ্বাস করো কালীনাথ, আমি একটা উঁচুবংশে, রাঢ়ের সবচেয়ে প্রাচীন ভদ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিলুম। এ লাইনে আসার আগে আমি পুলিশের চাকরিতে ঢুকেছিলুম—ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ। আর কী চেহারা না ছিল আমার। ছোকরা বয়স তো? তখন চেহায়া জেগে ছিল, কাউকে তোয়াক্কা করতুম না, শরীরে শক্তি ছিল, মনে সাহস ছিল, আজকের চার ডবল কাজ করতে পারতুম একাই—তারপর একদিন, বুঝলে—চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। আর একরকম করে জীবন শুরু করা গেল, নাটক নিয়ে—সেসব দিনের কথা কি তোমার মনে আছে কালীনাথ? তখন কী নামডাকই ছিল আমার! কী খাতির! কী প্রতিপত্তি! তারপর সেসব দিনও যেন কবে—কেমন করে ফুরিয়ে গেল, একেবারে নিঃশেষ করে দিয়ে গেল হে আমাকে—

[দাঁড়িয়ে কালীনাথের গায়ে ভর দিয়ে]

জানো, আগে আমি বুঝতে পারিনি; হঠাৎ এই মাঝরাতে আমি যখন এই stage-এর উপর এসে দাঁড়ালুম, থিয়েটার-এর Black-Wall-এর দিকে তাকালুম, এই একটু আগে সামনের ওই অন্ধকারের দিকে চেয়েছিলুম—হঠাৎ আমার মনে হল, কে যেন আমার জীবনের সমস্ত খাতাখানাকে, আমার চোখের সামনে মেলে ধরেছে। থিয়েটারের দেয়ালে দেয়ালে অঙ্কারের গভীর কালো অন্ধরে

লেখা, আমার জীবনের পঁয়তাল্লিশটা বছর কালীনাথ—কী জীবন!—ওই অন্ধকারে আশ্চর্য স্পষ্ট সেসব অক্ষর—আমি দেখলুম কালীনাথ—যেমন স্পষ্ট তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি এখন—ঠিক তেমনি—তেমনি স্পষ্ট—আমি একে একে সব পার হয়ে যেতে দেখলুম—আমার যৌবন, আদর্শ, শক্তি, সঙ্গম, প্রেম—নারী!—হ্যাঁ একটা মেয়ে! জানো, কালীনাথ, একটা মেয়ে!—

কালীনাথ : ঘুম পাচ্ছে? ঘুমোবেন চাটুজ্জমশাই?

রজনী : তখন আমার বয়স বেশি নয়—সবে এ লাইনে এসেছি, সারা দেহ-মনে ফুটছে টগবগ করে উৎসাহ। একদিন একটা মেয়ে থিয়েটার দেখে প্রেমে পড়ল আমার!—বিশ্বাস করো, সে বেশ বড়োলোকের মেয়ে, বেশ সুন্দর দেখতে ছিল মেয়েটা, ওর বাপের টাকাপয়সাও ছিল অঢেল,—মেয়েটা বেশ লম্বা, ফরসা, সুন্দর, ছিপছিপে গড়নের, উঠতি বয়স—আর মনটা ছিল দারুণ ভালো, কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই—সব ভালো তার—কিন্তু—ওরই মধ্যে কোথায় যেন আগুন লুকিয়ে ছিল—গ্রীষ্মের বিকেলে পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের মেঘ যে আগুন লুকিয়ে রাখে, সেই আগুন। কালীনাথ, সে কী আশ্চর্য মেয়ে কেমন করে বোঝাব তোমাকে? এমন গভীর ওর টানাটানা কালো চোখ যে অন্ধকার রাতে একা একা ভাবলে মনে হত সে যেন কোনো অচেনা দিনের আলো। কী অদ্ভুত হাসি তার। কী তার ঢেউখেলানো রাশি রাশি কালো চুল। দাঁড়াও, ওর চুলগুলোর কথা বুঝিয়ে বলি তোমাকে! সমুদ্রের ঢেউ দেখেছ তো? মনে হয় না ঢেউ-এ ঢেউ-এ কী আশ্চর্য শক্তি! কিন্তু জানো, যদি তোমার বয়স কম হত, যদি দৃষ্টি থাকত তোমার, যদি দেখতে ওর রাশি রাশি কালো চুলের ঢেউ, তাহলে তোমার ধারণা হত—কেমন করে দুর্গম পাহাড়কে ধ্বসিয়ে দেয় পাহাড়ি নদীর দুর্গম খরস্রোত—কোন অমোঘ শক্তির গতিতে সমস্ত পাহাড় থরথর করে উঠে তীব্র আক্ষেপে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, মুহূর্তে প্রলয় ঘটে যায় পৃথিবীতে, তখন কি মনে হত না তোমার—এ ঢেউ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তো যাক আমাকে উলটেপালটে দিয়ে যদি জীবনের খেলা খেলতে চায়, তো খেলুক!—সত্যি জানো, হঠাৎ মনে হয়, আমি ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমি যেন ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক যেমন এখন তুমি দাঁড়িয়ে আছ আমার সামনে!— আর একদিন—আর একদিন তাকে দেখে মনে হয়েছিল—ভোরের আলোর চেয়েও সুন্দর সে! সেই যে তার আমার দিকে সেই একরকম অদ্ভুত করে চেয়ে থাকা, মরে যাব তবু ভুলব না, তার সেই আশ্চর্য ভালোবাসা। ও শুধু আমাকে আলমগিরের পাট করতে দেখেছিল—আর কিছু নয়—আমার নিজের থেকে ওকে কোনো কথা বলতে হয়নি, রেখে, ঢেকে, সত্যি, মিথ্যে, কোনো কথা না। একদিন যেচে আলাপ করল আমার সঙ্গে, তারপর ক্রমশ আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা—ঘনিষ্ঠতা থেকে প্রেম। আর তখনকার দিনে আমার অ্যাকটিং মানে, সে একটা ব্যাপার। তখন তো আমার বয়সও বেশি না, সামনে পড়ে রয়েছে ব্রিলিয়ান্ট ফিউচার। তখন নিজের ওপর কত জোর ছিল হে! তখন মনে মনে কত আশা, কত প্ল্যান! একদিন ওকে বললাম, “অনেক দিন তো আলাপ হল আমাদের, চলো এবার বিয়ে করি আমরা, এমনি করে আর কদিন থাকব আমরা। এবার আমাদের বিয়ের কথাটা তোমার বাবাকে বলি একদিন?”

[গলার স্বর ডুবে যায়]

ও কী বলল জানো? “হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, চলো বিয়ে করি, কিন্তু তার আগে তুমি ওই থিয়েটার করা ছেড়ে দাও।” থিয়েটার করা ছেড়ে দেব?...কেন? ও যে বড়োলোকের সুন্দরী

মেয়ে, থিয়েটারের লোকের সঙ্গে জীবনভর প্রেম করতে পারে, কিন্তু বিয়ে? নৈব নৈব চ! আমার মনে আছে, সে রাত্তিরে কী যে পাট করছিলুম, কী যেন কী একটা...বাজে হাসির বই—স্টেজে দাঁড়িয়ে পাট করতে করতে হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে গেল। সেই রাতেই জীবনে প্রথম মোক্ষম বুঝলুম যে, যারা বলে ‘নাট্যাভিনয় একটি পবিত্র শিল্প’—তারা সব গাধা—গাধা। তারা সব মিথ্যে কথা—বাজে কথা বলে। অভিনেতা মানে একটা চাকর—একটা জোকার, একটা ক্লাউন। লোকেরা সারাদিন খেটেখুটে এলে তাদের আনন্দ দেওয়াই হল নাটক-ওয়ালাদের একমাত্র কর্তব্য। মানে এককথায়—একটা ভাঁড় কি মোসায়েবের যা কাজ তাই। আর সেইদিনই বুঝলুম পাবলিকের আসল চরিত্রটা কী! তারপর থেকে ওসব ফাঁকা হাততালিতে, খবরের কাগজের প্রশংসায়, মেডেল, সার্টিফিকেটে, ‘নাট্যাভিনয় একটি পবিত্র শিল্প’—এসব বাজে কথায় আমি বিশ্বাস করি না। পাবলিক মহোদয় আলবত হাততালি দেবেন—খুব প্রশংসা করবেন—সব ঠিক—কিন্তু যেই তুমি স্টেজ থেকে নামলে—তুমি তাঁদের কেউ না—তুমি থিয়েটারওয়ালা—একটা নকলনবীশ—একটা অস্পৃশ্য ভাঁড়,—তা বলে কি তাঁরা তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন না, চা সিগারেট খাওয়াবেন না? তা খাওয়াবেন। অনেক কথা বলবেন, আলাপ-আলোচনা করবেন, হাসবেন, নমস্কার করবেন—তা নইলে বাইরে জাহির করবেন কী করে? “ও অমুক আর্টিস্ট! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে আমি চিনি, ওর সঙ্গে আমার খুব খাতির, উনি তো সেদিন অবধি আমার ঘরে—” সব ঠিক। কিন্তু কোনো সামাজিক সম্মান তুমি পাবে না। থিয়েটারের পরিচয়ে কেউ তার মেয়ে কিংবা বোনের সঙ্গে বিয়ে দেবে কারও? কক্ষনো না। জানো, তোমার ওই পাবলিক, মানে থিয়েটারের টিকিট-কেনা খদ্দেরদের আমি, কাউকে বিশ্বাস করি না।

কালীনাথ : পুরোনো দিনের কথা ভুলে যান চাটুজ্জেশমশাই। শুধু শুধু মন খারাপ করে কী হবে! চলুন বাড়ি নিয়ে যাই আপনাকে—

রজনী : ‘নাট্যাভিনয় একটি পবিত্র শিল্প!’ এই পবিত্রতার নামাবলিটা সেদিন হঠাৎই ফাঁস হয়ে গেল আমার সামনে—হঠাৎ।—আর তারপর থেকে—সেই মেয়েটা—কী হল কে জানে। আমারও আর কিছু ভালো লাগত না—ভবিষ্যতের চিন্তা-টিস্তা সব—বই বাছাই-ফাছাই মাথায় উঠে গেল, আবোলতাবোল সব পাট করতে লাগলাম—সেসব যা-তা পাট। লোকের মুখে শুনলাম, জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতে, এইসব দেখেটেখেই নাকি দেশের ছোঁড়াগুলো গোপ্লায় যাচ্ছে। তবু যেই স্টেজে নেমেছি, তখন ওইসব জ্ঞানী ব্যক্তিরাই বলেছেন, ‘বাঃ বাঃ দারুণ! কী ট্যালেন্ট!’ ধুত্তোর নিকুচি করেছে ট্যালেন্টের! আস্তে আস্তে বয়স বাড়ল, গলার কাজ নষ্ট হয়ে গেল, একটা নতুন চরিত্রকে বোঝবার, ফুটিয়ে তোলবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেল, থিয়েটারের দেয়ালে দেয়ালে কার অদৃশ্য হাত, অঙ্গারের কালো কালো জ্বলন্ত অক্ষরে লিখে দিয়ে গেল প্রাক্তন অভিনেতা রজনী চাটুজ্জের প্রতিভার অপমৃত্যুর করুণ সংবাদ! আমি আগে বুঝতে পারিনি জানো!—আজ রাতে—সবে হঠাৎ—ঘুম থেকে চমকে জেগে উঠে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম কথাটা। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি—অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে,—আমারই জীবনের আটষট্টিটা বছর—আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো রজনী চাটুজ্জ—আর ক-পা এগোলেই শ্মশানের চিতার আঁচ লাগবে গায়। [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] বলসে দেবে আমাকে—

কালীনাথ : পুরোনো দিনের কথা ভুলে যান চাটুজেমশাই, পুরোনো দিনের কথা ভুলে যান। আপনি চুপ করে বসুন এখানে। আর কিছু ভাববেন না। ভগবান আছেন চাটুজেমশাই। অদৃষ্ট তো মানেন আপনি। [ঢেঁচিয়ে] রামব্রিজ! রামব্রিজ!

রজনী : [হঠাৎ জেগে] সেসব দিনে কী না পারতাম। যেমন খুশি তাই পারতাম! তোমার মনে আছে সেসব দিনের কথা? —কী সহজে এক-একটা চরিত্র বুঝতে পারতাম—কী আশ্চর্য সব নতুন রঙের চরিত্রগুলো চেহারা পেত—কী অসীম বিশ্বাসে ভরা ছিল [বুকে ঘা মেরে] এ জায়গাটা।—শোনো হে, শোনো তো বলি। দাঁড়াও, একটু দম টেনে নিই আগে—মনে আছে, ‘রিজিয়া’ নাটকে বক্তব্যারের সিনটা—?

“শাহজাদি! সম্রাটনন্দিনী! মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে?

জননা কি তাতার-বালক মাতৃ অঙ্ক হতে ছুটে যায়

সিংহশিশু-সনে করিবারে মল্লরণ?

শাগিত ছুরিকা ক্ষুদ্র ক্রীড়নক তার!

জীবনের ভয় দেখাও সম্রাজ্ঞী?

বক্তব্যার মরিতে প্রস্তুত সদা।”

খুব খারাপ হচ্ছে না, কী বলো? আচ্ছা, ওই সিনটা মনে আছে তোমার? সেই যে ডি. এল. রায়ের ‘সাজাহান’ নাটকে ঔরঙ্গজীব আর মহম্মদের সিনটা?—প্রথম ঔরঙ্গজীব একা—

“বড়ো ভয়ংকর এ যোগ। শাহনাওয়াজ আর যশোবন্ত সিংহ। আমি কিন্তু প্রধান আশঙ্কা করছি এই মহম্মদকে। তার চেহারা—কম কথা কয়। আমার প্রতি একটা অবিশ্বাসের বীজ তার মনে কে বপন করে দিয়েছে। জাহানারা কি?—এই যে মহম্মদ!” [অধৈর্য হয়ে] আঃ! কাম অন, কুইক! মহম্মদের ক্যাচটা দাও তো, মহম্মদের ক্যাচটা।

কালীনাথ : “পিতা আমায় ডেকেছিলেন?”

রজনী : “হ্যাঁ, আমি কাল রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি, তুমি সুজার অনুসরণ করবে।

মিরজুমলাকে তোমার সাহায্যে রেখে গেলাম।”

কালীনাথ : “যে আজ্ঞা পিতা।”

রজনী : “আচ্ছা যাও। দাঁড়িয়ে রইল যে? এ বিষয়ে কিছু বলবার আছে?”

কালীনাথ : “না পিতা। আপনার আজ্ঞাই যথেষ্ট।”

রজনী : “তবে?”

কালীনাথ : “আমার একটা আরজি আছে পিতা।”

রজনী : “কী!—চুপ করে রইলে যে। বলো পুত্র!”

কালীনাথ : “কথাটা অনেকদিন থেকে জিজ্ঞাসা করব মনে করছি, কিন্তু এ সংশয় আর বন্ধে চেপে রাখতে পারি না। ঔষ্ধত্ব মার্জনা করবেন।”

রজনী : “বলো।”

কালীনাথ : “পিতা! সম্রাট সাজাহান কি বন্দি?”

রজনী : “না! কে বলেছে?”

কালীনাথ : “তবে তাঁকে প্রাসাদে বুদ্ধ করে রাখা হয়েছে কেন?”

রজনী : “সেবুপ প্রয়োজন হয়েছে।”

কালীনাথ : “আর ছোটো কাকা?”

রজনী : “মোরাদ?”

কালীনাথ : “তাঁকে এরূপে বন্দি করে রাখা কি প্রয়োজন?”

রজনী : “হ্যাঁ।”

কালীনাথ : “আর আপনার এই সিংহাসনে বসা—পিতামহ বর্তমানে?”

রজনী : “হ্যাঁ পুত্র।”

কালীনাথ : “পিতা।”

রজনী : “পুত্র! রাজনীতি বড়ো কূট। এ বয়সে তা বুঝতে পারবে না। সে চেষ্টা করো না।”

কালীনাথ : “পিতা! ছলে সরল ভ্রাতাকে বন্দি করা, স্নেহময় পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করা, আর ধর্মের নামে এসে এই সিংহাসনে বসা—এর নাম যদি রাজনীতি হয়, তাহলে সে রাজনীতি আমার জন্য নয়।”

রজনী : আগেকার দিনে যে-পার্টগুলো করেছি সেগুলো এখন দাঁড়িয়ে বলতে-বলতে, শুনতে শুনতে, ভেতরটা যেন কেমন করে, না? আচ্ছা, তুমি আমাকে আর একটা জায়গা মনে করিয়ে দাও তো! পুরোনো দিনের যে-কোনো নাটকের যে-কোনো জায়গা—ধরো—ধরো ‘সাজাহান’ নাটকের ঔরঙ্গজীবের সেই ভয়ংকর সিনটা, যখন সবাইকে খুন করে ঔরঙ্গজীব সিংহাসন পেয়েছেন—তখন একদিন মাঝরাতে ঔরঙ্গজীব একা—একেবারে একা—ভাবছেন—“যা করেছি ধর্মের জন্য। যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হত।—উঃ কী অন্ধকার! কে দায়ী? আমি!—এ বিচার! ও কী শব্দ?—না, বাতাসের শব্দ। এ কী! কোনোমতেই এ চিন্তাকে মন থেকে দূর করতে পাচ্ছি না। রাতে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ি। কিন্তু নিদ্রা আসে না—উঃ কী স্তব্ধ। এত স্তব্ধ কেন? ও কী!—ও কী! আবার সেই দারার ছিন্ন শির।—সুজার রক্তাক্ত দেহ।—মোরাদের কবন্ধ। যাও সব। আমি বিশ্বাস করি না। ওই তারা আবার আমায় ঘিরে নাচছে! —কে তোমরা? জ্যোতির্ময়ী ধূমশিখার মতো মাঝে মাঝে জাগ্রত তন্দ্রায় এসে দেখা দিয়ে যাও! চলে যাও! মোরাদের কবন্ধ আমায় ডাকছে। দাদার মুণ্ডু আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে; সুজা হাসছে—এ কী সব! ওঃ।”

[হাততালি দিয়ে জোরে হেসে ওঠেন]

সাব্বাশ! সাব্বাশ! এখন বয়েসগুলো কোন্ চুলোয় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হে! কোথায় গেল আটশষ্টিটা বছরের শোক! কোথায় চিতার আঁচটা!—আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি কালীনাথ, আমার প্রতিভা এখনও মরেনি,—শরীরে যদি রক্ত থাকে, তাহলে সে রক্তে মিশে আছে প্রতিভা।—এর নাম যদি যৌবন না হয়, শক্তি না হয়, জীবন না হয়, তাহলে জীবন বস্তুটা কি কালীনাথ? প্রতিভা যার আছে, বয়েসে তার কী আসে যায়! এই তো জীবনের সত্য কালীনাথ—আমার অ্যাকটিং তোমার—তোমার ভালো লেগেছে—না? সত্যি ভালো লেগেছে—না?—আমার আরও মনে আছে,

জানো! সেই শাস্ত্র গভীর পূর্ণতার কথা—শোনো জীবনের শেষ যুদ্ধযাত্রার আগের রাতে সুজার সেই কথাগুলো—পিয়ারাবানুকে বলা—‘আজ তবে হাসো, কথা কও, গাও যা দিয়ে আমাকে এতদিন ছেয়ে দিতে, ঘিরে বসে থাকতে! একবার শেষবার দেখে নেই, শুনে নেই। তোমার বীণাটি পাড়ো! গাও—স্বর্গ, মর্ত্যে নেমে আসুক। ঝঙ্কাতে আকাশ ছেয়ে দাও। তোমার সৌন্দর্যে একবার এ অন্ধকারকে ধাঁধিয়ে দাও দেখি। তোমার প্রেমে আমাকে আবৃত করে দাও। বোসো, আমি আমার অশ্বারোহীদের বলে আসি। আজ সারারাত্রি ঘুমাব না।’ [বাইরে দরজা খোলার শব্দ] কে?

কালীনাথ : এ নিশ্চয় রামব্রিজ! আপনার প্রতিভা এখনও মরেনি চাটুজ্জ্যে মশাই। ঠিক পুরোনো দিনের মতোই আছেন আপনি। পুরোনো দিনের মতো—

রজনী : [দরজার শব্দের দিকে চোঁচিয়ে] ইধর, এ রামব্রিজ, সিধে ইস্টেজ পর চলে আও। [কালীনাথকে] বয়েস বেড়েছে তো কী হয়েছে কালীনাথ? এই তো জীবনের নিয়ম! [আনন্দে হেসে ওঠেন] আরে তুমি কাঁদছ কালীনাথ! তোমার চোখে জল, কেন বল তো? আরে এসো এসো, দূর কাঁদে নাকি? [বুকে জড়িয়ে ধরে জলভরা চোখে] শিল্পকে যে-মানুষ ভালোবেসেছে—তার বার্ষিক্য নেই কালীনাথ, একাকীত্ব নেই, রোগ নেই, মৃত্যুভয়ের উপর সে তো হাসতে হাসতে ডাকাতি করতে পারে—[চোখের জল গড়িয়ে পড়ে] হ্যাঁ কালীনাথ, আমাদের দিন ফুরিয়েছে। হায়রে প্রতিভা! কোথায় গেল বলো তো? জীবনের পাত্র শূন্যতায় রিক্ত করে দিয়ে, কোথায়, কার কাছে, কোন দেশে গেল প্রতিভা? যাবার আগে মজলিশি গল্পের আস্তাকুঁড়ে নির্বাসন দিয়ে গেল আমাকে!—আর তুমি! সারা জীবন থিয়েটারের প্রম্পটার হয়েই তোমার জীবন ফুরিয়ে গেল!—চলো কালীনাথ, চলো যাই—[যেতে আরম্ভ করে] জানো, সত্যি কথা বলতে কী, ওসব প্রতিভা-টতিভা আমার কিছু নেই—দিলদারের পাঁটটা মন্দ করি না—তাও আর বছর কয়েক পরে মানাবে না আমাকে, তাই না? অতএব ওখেলোর সেই কথাগুলো মনে আছে তোমার! সেই যে—

Oh, now forever

Farewell the tranquil mind! farewell content!

Farewell the plumed troops, and the big wars

That makes ambition virtue! O, farewell!

Farewell the neighing steed and the shrill trump,

The spirit-stirring drum, th’ ear-piercing fife.

The royal banner, and all quality,

Pride, pomp, and circumstance, of glorious war!

কালীনাথ : আমি বলছি রজনী চাটুজ্জ্য মরবে না—কিছুতেই না—

রজনী : কিংবা ধরো—

Life’s but walking shadow, a poor player,

That struts and frets his hour upon the stage,

And then is heard no more.

[একেবারে নেপথ্যে]

A horse! A horse! My kingdom for a horse!

